সন্ত্রাস □ চাঁদাবাজি □ দখল

কঠিন সংকটের মুখোমুখি বিএনপি

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয় সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-দখল... বর্তমান বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধেও উঠছে একই অভিযোগ... লিখেছেন দৈনিক জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ

দু'মাসেও বিএনপি সরকার প্রশাসনে কোনো গতি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সন্ত্রাস দমন হয়নি, বরং বেড়েছে। টপটেররা একে একে জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে চলছে হানাহানি। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা আবার হল দখলের অভিযান শুরু করেছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা আর পাল্টা হামলা চালাচ্ছে। ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে ভয়াবহ আতঙ্ক। লেখাপড়ার পরিবেশ এখনও দূরীভূত। যানজটের হাত থেকে রেহাই পায়নি নগরবাসী। এসিড নিক্ষেপের আতঙ্কে নারী-পুরুষ চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। শেষ হচ্ছে মাহে রমজান। আসছে ঈদ। এই সুযোগে জিনিসপত্রের দাম দফায় দফায় বাড়তে শুরু করেছে। বাড়ছে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি।

জনমনে হাজারো প্রশ্ন, তবে কি এ দেশের মানুষ আর কোনোদিনই দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাবে না? বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে একেকজন ক্ষমতায় এসে কি শুধু নিজেদের উদরপূর্তি করে সাধারণ মানুষকে ঠেলে দেবে অস্থিরতার দিকে? '৭৩-এর পর থেকে তাই হচ্ছে। আর কত কাল গণতন্ত্রের নামে এমনি প্রহসনের পুনরাবৃত্তি চলবে?

আফগান যুদ্ধের পর উদ্ভূত সংকটে বিএনপি'র ক্ষমতারোহণে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে আকস্মিক প্রতিকূলতা। এরপরও দীর্ঘদিনের নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও দুর্নীতিতে জরাগ্রস্ত প্রশাসনিক জটাজালের হাত থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চায়। আপামর জনগণ এই মুক্তির জন্য উদগ্রীব।

নির্বাচনের অব্যবহিত পর পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে বেগম জিয়া দলীয় এমপিদের কাছে দেশের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিলেন। অর্থনৈতিক অবস্থা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আর প্রশাসনিক দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি অপব্যয় ও অতিরিক্ত ব্যয় পরিহারের জন্য সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর ঠিক পরের দিন ৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভার শপথ নেয়ার দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে একটা দরিদ্র দেশে এই বিশাল মন্ত্রিসভা গঠনের যৌক্তিকতা কতটুকু? এর পরও শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ওপর সাত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এ

'প্রকৃতপক্ষে আমরা কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না। নিলে এ ধরনের মরাত্মক ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটত না কখনও। শুধু 'ক্রটাল মেজরিটি' লাভের আত্মতুষ্টি নিয়ে দেশ চালাতে গেলে বিএনপিকে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে'

অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সার্বিক তদারকি করবেন কখন? এমনিতেই যোগ্য, দক্ষ ও দায়িত্বশীল লোকজনের সংখ্যা সীমিত। তাই যখনই গুরুত্বপূর্ণ পদে অতিরিক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন হবে সেখানে শুধু দায়িত্বহীন স্বার্থপর ব্যক্তির সমাবেশই ঘটবে। তাতে সৃষ্টি হবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে পদে পদে। এছাড়া একজন মন্ত্রীর পেছনে মাসে ব্যয় হবে কমপক্ষে তিন লাখ টাকা। আর ৬০ মন্ত্রীর জন্য মাসে ব্যয় করতে হবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা। বছরে এদের জন্য ব্যয় হবে তেইশ কোটি টাকার বেশি। এছাড়াও মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তার টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পানির খরচ তো আছেই। অর্থের বিনিময়ে অনেককে মন্ত্রী বানানোর অনেক রসালো নেপথ্য কাহিনীও লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। নির্বাচনের আগে একেক ব্যবসায়ীকে বিরাট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে মনোনয়ন দেয়ার কথাও শোনা গেছে। এ কাজটি প্রধান দুই দলের কর্তা ব্যক্তিরাই করেছেন। এটি রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ভয়াবহ অশনিসঙ্কেত, তা বোধ হয় তারা কেউই উপলব্ধি করতে পারেননি। এমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে পার্লামেন্ট সৎ, আত্মত্যাগী ও বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বশূন্য অসাড় হয়ে পড়বে। কোটি কোটি টাকা উপঢৌকনের বিনিময়ে দেশের সেরা সন্ত্রাসী, কালোবাজারি, চোরাচালানি আর অস্ত্র ব্যবসায়ীরাই কেবল নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়ে এবং নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে মন্ত্রীর সিংহাসন দখল করবে। সংসদে বসে আইন প্রণয়ন করবে। তাতে কি দেশ ও জাতির কোনো মঙ্গল হবে? এদের দিয়ে কি সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার কাজ করা সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে আমরা কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না। নিলে এ ধরনের মরাত্মক ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটত না কখনও। বিগত সরকারের বাঘা বাঘা একেক মন্ত্রীর ধরাশায়ী হওয়ার কারণগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করেই বিএনপি নেতাদের অতি সতর্কতার সঙ্গে কথা বলা ও সামনের দিকে এগিয়ে চলা প্রয়োজন। শুধু 'ক্রটাল মেজরিটি' লাভের আত্মতুষ্টি নিয়ে দেশ চালাতে গেলে বিএনপিকে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। একটি ধ্রুব সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন, জনগণ বিএনপিকে ভোট দেয়নি। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্যই জনগণ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই বিএনপি ভোট পেয়েছে। নির্বাচিত হয়েছে। ক্ষমতায় এসেছে। কাজেই জনগণ কি চায় তা উপলব্ধি করতে হবে। জনগণের ইচ্ছানুসারেই কাজ করতে হবে। '৯৫ সালে কতিপয় সচিবের নেতৃত্বে সেক্রেটারিয়েটের বেশ কিছুসংখ্যক কর্মচারী সদলবলে 'জনতার মঞ্চে' যোগ দিয়ে বিশেষ একটি দলের বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে সেদিন তাদের পদস্খলন ঘটেছিল। নিরপেক্ষতা হারিয়েছিলেন। কতিপয় শিক্ষক, বিভিন্ন এনজিও কর্মীসহ কিছু পেশাজীবী মানুষও এসে ভিড় জমিয়েছিল সে মঞ্চের আশপাশে। এরা কেউ কি তারপর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জনগণের কল্যাণে কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন? আর তাই বিভিন্ন জেলার ডিসি-এসপি বিগত সরকারি দলের সভাপতি-সেক্রেটারি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাদের কার্যকলাপ থেকেই এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি

সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের পর্যন্ত দলীয়ভুক্ত করার প্রচেষ্টা ছিল দীর্ঘদিনের। ১৯৭৪ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে যখন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, সেখানেও সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাদের বাকশালে অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার জন্যই '৭৩ সালে আত্মনিবেদিত দলীয় সদস্যদেরই কেবল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এতো কিছুর পরও জনগণ বার বার এসব চক্রান্ত ব্যর্থ করে সুস্থ, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে রায় দিয়েছে। গণতান্ত্রিক পন্থায় মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে।

সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাত্রদল ইতিমধ্যে বিএনপিকে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিএনপিকে ক্ষমতায় এনেছে জনগণ, ছাত্রদল নয়। তাই বিএনপি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, ছাত্রদলের কাছে নয়। বেআইনি অস্ত্রে পরিবেষ্টিত সাবেক এমপি ইকবালের কথা কারও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। সেই শক্তিধর ইকবালেরও পতন ঘটেছে— এ রূঢ় সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। গণতন্ত্রের উত্তরণের এই পর্যায়ে এসব সন্ত্রাসীকে নির্মূল করা না হলে ওরাই ভবিষ্যতে একেকটি হাজারী, শামীম ওসমান, হাসানাত, তোফায়েল, গোলন্দাজ, দিপু, মায়া অথবা কাদেরের উত্তরসূরি হয়ে দাঁড়াবে। এ দেশটাকে নরকের আস্তাকুড়ে পরিণত করবে। হাজারীর বংশধররা আজও জীবিত। ওদের উত্তরসূরির সংখ্যা বাড়ছে ব্যাপকভাবে। অনেক নেতা-নেত্রীই আজ আবার মাঠ গরম করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। যারা আর কোনোদিন হরতাল করবেন না, ধ্বংসের রাজনীতি পরিহার করবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন— আজ তারা একটা লাশের পরিবর্তে দশটা লাশ ফেলে দেয়ার হুমকি দিচ্ছেন। আঘাত এলে প্রত্যাঘাত করো বলে কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন। হরতাল করে সমগ্র দেশটা অচল করে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছেন। মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। বিদেশীদের মধ্যেও চালাচ্ছেন মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। এদেরই একটি গোষ্ঠী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে অবাধে চালাচ্ছে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। খুন, ধর্ষণও চালাচ্ছে তাদেরই অনেকে। এছাড়া তাদেরও তো ক্যাডার বাহিনী রয়েছে। রয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য নেতা-নেত্রীর নির্দেশ।

'একটি ধ্রুব সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন, জনগণ বিএনপিকে ভোট দেয়নি। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্যই জনগণ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই বিএনপি ভোট পেয়েছে'

এমনি উত্তপ্ত সংকটময় পরিস্থিতিতে কেবল বেগম জিয়াকে বীরদর্পে এগিয়ে যেতে হবে। যাদের মন্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন তারাও বিগত দিনের মন্ত্রীদের মতোই লুটপাটের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তারাও আজ সন্ত্রসী পরিবেষ্টিত। তারাও শ' শ' বাচ্চু মোল্লাকে নিয়ে চলাচল করেন। এছাড়া ছাত্রদল আর যুবদলের কেউ কেউ আবার চাঁদাবাজি, দখল আর সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে ব্যাপকভাবে। অবিলম্বে এসব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। প্রয়োজনে জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হোক। আন্তর্জাতিক অবস্থা, আফগান যুদ্ধ, জাতীয় অর্থনৈতিক সংকট আর সন্ত্রাসী তৎপরতা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য সমগ্র দেশে আজ বিরাজ করছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। সরকারকেই এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।